بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মোতাবেক ১৯ তাবুক, ১৩৮৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

এটি রমজান মাস, মনে হচ্ছে যেন গতকাল আরম্ভ হয়েছে, খুব দ্রুততার সাথে এ দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। দ্বিতীয় দশকও এখন দুই তিন দিনের ভেতর শেষ হতে যাচ্ছে, আর এরপর শেষ দশক আরম্ভ হয়ে যাবে।

একটি রেওয়ায়েতে রমজানের গুরুত্ব এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, هُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحمَةٌ وَاَوسَطُهُ مَغفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتقٌ مِّنَ النَّارِ (সহীহ্ ইবনে খাযিমা, কিতাবুস সিয়াম)। অর্থাৎ এটি এমন এক মাস যার প্রথম দশক রহমত, মধ্যম দশক ক্ষমা লাভের কারণ এবং শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ।

এ হাদীসের বিভিন্নভাবে রেওয়ায়েত করা হয়েছে, কোন কোনটি কিছুটা বিস্তারিত আর কোন কোনটি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই যে তিন দশকের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে, তা সবগুলো হাদীসেই বিদ্যমান। যেমনটি আমি বলেছি যে, বর্তমানে আমরা দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করছি। এর এখনও দুই-তিন দিন বাকি আছে। আর এরপর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তৃতীয় দশক আরম্ভ হবে– যার সম্পর্কে উক্ত রেওয়ায়েত অনুসারে বলা হয় যে, এটি আগুন থেকে মুক্তি লাভের দশক। এখন আমি বর্তমান দশক অর্থাৎ মাগফিরাতের দশক সম্পর্কে আর এরপর শেষ দশক সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণনা করব। মাগফিরাত, তওবা এবং আগুন থেকে মুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে আমাদের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এখন আমি সেগুলো বর্ণনা করছি।

ইস্তেগফারের নির্দেশ এমন একটি নির্দেশ যা আল্লাহ্ তা'লা নিজেও মু'মিনদেরকে প্রদান করেছেন আর নবীগণের মাধ্যমেও বলিয়েছেন এবং মু'মিনদেরকে ইস্তেগফারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নবীদের বলেছেন যে, ইস্তেগফারের প্রতি মু'মিনদের মনোযোগ আকর্ষণ কর। আর যখন আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে ''وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰه'' অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর– মর্মে নির্দেশ দেন তখন একইসাথে এটিও বলেন যে, ''اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ'' অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং বার বার কৃপাকারী। অতএব আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেও এই ঘোষণা করিয়েছেন যে, মু'মিনদের বলে দাও, এই মাস ক্ষমার মাস। আর নিজেও এ সম্পর্কে বলছেন যে, আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি ক্ষমা করব, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু, তাই আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করেনও। এটি হতে পারে না যে, আল্লাহ্র বান্দারা ক্ষমার জন্য তাঁর সামনে বিনত হবে আর তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। আসলে এই দয়া, ক্ষমা ও আগুন থেকে মুক্তি একই পরিণামের ভিন্ন ভিন্ন অংশ, আর তা হলো শয়তানের সাথে দূরত্ব এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই একজন মানুষ রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ করে, ইবাদতেরও সামর্থ্য লাভ করে আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বৈধ কাজ পরিত্যাগেরও সামর্থ লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের সকল দুর্বলতা, ভুল-ত্রুটি ও পাপকে ক্ষমা করে এমন মানুষকে নিজের

ক্ষমার চাদরে আবৃত করে নেন। এই ক্ষমাও আল্লাহ্ তা'লার রহমতেই হয়ে থাকে। ক্ষমার পরে আল্লাহ্ তা'লার রহমত ফুরিয়ে যায় না বরং ক্ষমা এবং তওবার ধারাবাহিকতা আল্লাহ্ তা'লার দয়া এবং তাঁর অনুগ্রহে অব্যাহত থাকে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার কল্যাণে একজন মানুষ, যে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তার মাধ্যমে এরপর এমনসব কাজ সম্পাদিত হয় যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে আকর্ষণ করে থাকে। এমনসব সৎকর্ম সে সম্পাদন করে যা করার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, এর ফলে সে আগুনের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করে।

যখন লাগাতার ইস্তেগফার করে এবং পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে, আর সেই ইস্তেগফারের বদৌলতে মু'মিন আল্লাহ্ তা'লার রহমতের দৃশ্য অবলোকন করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জান্নাত সমূহ থেকে কল্যাণ লাভ করতে থাকে, তখন যেন সে নাজাত পেয়ে গেল। এরপর আগুন তাকে কীভাবে স্পর্শ করতে পারে? অতএব রমজানের এই যে তিন দশকের কথা বলা হয়েছে, এগুলো একটি অপরটির সাথে গ্রথিত ও কর্মের বা আমলের শর্তে শর্তসাপেক্ষ। কেবল রমজান মাস অথবা সেহরী ও ইফতারীর মধ্যবর্তী সময়ে খাবার না খাওয়া মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার রহমত, ক্ষমা এবং আগুন থেকে মুক্তি লাভের অধিকার দিয়ে দেয় না। সুতরাং যখন আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দাদেরকে এ বিষয়গুলো প্রদানের জন্য রমজান মাসে একটি বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করেন, শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করেন এবং দোয়া গ্রহণের জন্য নিজ বান্দাদের নিকটবর্তী হয়ে যান, তখন এগুলো লাভ করার জন্য বান্দাদের অধিক থেকে অধিকতর চেষ্টাসাধনা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা যে বলেছেন, হে বান্দারা! আমার প্রতি নিরাশ হইও না। আমি রহীম ও করীম এবং সাত্তার ও গাফ্ফার আর তোমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াকারী। এভাবে তোমাদের প্রতি আর কেউ অনুগ্রহ করবে না যেভাবে আমি করি। নিজ পিতাদের তুলনায় আমাকে অধিক ভালোবাস কেননা প্রকৃতপক্ষে আমি তোমাদেরকে তাদের তুলনায় অধিক ভালোবাসি। তোমরা যদি আমার দিকে ধাবিত হও তাহলে আমি তোমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিব আর তোমরা যদি তওবা কর তাহলে আমি তা গ্রহণ করব। তোমরা যদি আমার দিকে ধীর গতিতেও আস আমি ছুটে আসব। যে ব্যক্তি আমাকে অন্বেষণ করবে সে আমাকে পাবে আর যে আমার দিকে আসবে সে আমার দ্বার খোলা পাবে। পাহাড়ের চেয়ে অধিক পাপ হলেও আমি তওবাকারীর পাপ ক্ষমা করি। আমার দয়া তোমাদের প্রতি অনেক বেশি এবং ক্রোধ কম, কেননা তোমরা আমারই সৃষ্টি। আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাই আমার রহমত বা দয়া তোমাদের সকলকে পরিবেষ্টন করে আছে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা যেখানে সাধারণ সময়েই এত কৃপাশীল, সেখানে রমজান মাসে তাঁর কৃপাবারি কত বেশি বর্ষিত হবে তা কেউ ধারণাই করতে পারে না।

অতএব আমাদের মধ্যে তারা সৌভাগ্যবান, যারা রমজানের এই গত হয়ে যাওয়া দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও ক্ষমা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। এই দিনগুলো থেকে আশিসমণ্ডিত হওয়ার সময় এখনও আছে। মানুষ যখন বিনয়ের সাথে তাঁর প্রতি অবনত হয়, তখন যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন– এভাবে কেউ-ই তোমাদের প্রতি কৃপা করে না, যেভাবে আমি করে থাকি; যে ব্যক্তি আমাকে সন্ধান করবে সে আমাকে লাভ করবে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভের জন্য, তাঁর ক্ষমা লাভের জন্য তাঁকে সন্ধান করা প্রয়োজন। আর তিনি এই ঘোষণাও দিয়েছেন যে, যে আমার সন্ধানে আসবে- সাধারণ সময়েও আর

বিশেষভাবে এই দিনগুলোতে, সে আমার দ্বার উন্মুক্ত পাবে। আমি লুক্কায়িত নই, সামনেই রয়েছি; আর (আমার) দরজাও খোলা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে যেখানে রমজানের রোযার ব্যাপারে তাগাদা দেয়া হয়েছে, সেই আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা إِنِّي قَرِيبٌ (অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি নিকটেই আছি') শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা নিকটেই আছেন এবং (তাঁর) দরজাও খোলা রয়েছে। তিনি বলেন, এসো এবং আমার ক্ষমার ছায়াতলে আশ্রয় নাও। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সৃষ্টজীবের প্রতি তো সাধারণ অবস্থায়ও আমার ক্রোধ অতি সামান্য এবং কৃপা অধিক; আর এই দিনগুলোতে আমি আরও বেশি কৃপার দুয়ার খুলে দেই এবং ক্ষমার চাদরে আবৃত করি।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (সূরা নিসা: ৬৬) অর্থাৎ তারা অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লাকে তওবা গ্রহণকারী এবং বারংবার কৃপাকারী হিসেবে পেত, এখানে আল্লাহ্ তা'লা এক প্রকার আক্ষেপ করেছেন যে- আমি যে এত কৃপালু ও দয়ালু, আমি তওবা গ্রহণ করি, নিজ ক্ষমার চাদরে আবৃত করি, তারপরও মানুষ নিজ প্রাণের প্রতি অবিচার করে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করে না।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার বারংবার বিভিন্ন আঙ্গিকে ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা এই ঘোষণা দিচ্ছে যে, বান্দার ইস্তেগফার অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে আকর্ষণ করে। তাদের ধারণা ভুল যারা বলে, ইস্তেগফার তাদের কোন উপকারে আসে না। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বলেছেন এবং এটি মহানবী (সা.)-এর হাদীসও বটে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বান্দা যখন আমার দিকে হেঁটে আসে, তখন আমি দৌড়ে আসি। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেছেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবূত: ৭০) অর্থাৎ আর যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের পথপানে আসার সামর্থ্য দান করব। সুতরাং ইস্তেগফার আল্লাহ্ তা'লার দিকে যাওয়ার একটি পথ। কিন্তু ইস্তেগফার আসলে কী?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় এর মর্মার্থ বর্ণনা করছি। তিনি (আ.) বলেন:

"ইস্তেগফারের প্রকৃত ও মূল অর্থ হলো, খোদার কাছে আবেদন-নিবেদন করা যেন মানবীয় কোন দুর্বলতা প্রকাশ না পায় এবং খোদা তা'লা যেন ফিতরত তথা মানব প্রকৃতিকে নিজ শক্তিবলে বলীয়ান করেন এবং নিজ সাহায্য-সমর্থনের গণ্ডিভুক্ত করে নেন। . . . . . অতএব এর অর্থ হলো, খোদা যেন নিজ শক্তিবলে ইস্তেগফারকারী ব্যক্তির মানবীয় দুর্বলতাকে ঢেকে রাখেন।" [মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আপনি তাহরিরাত কী রু ছে, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৬৭] অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইস্তেগফার করছে, তার মানবীয় দুর্বলতা যেন আল্লাহ্ ঢেকে দেন। এখন এটি অসম্ভব যে, মানবীয় দুর্বলতা কখনোই প্রকাশ পাবে না। মানুষ দুর্বল, তাই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েই থাকে। শয়তান সর্বদা আক্রমণের সুযোগ খুঁজে। মানুষ যখন আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়, শয়তান তখনই আক্রমণ করে। তাই শয়তান থেকে তখনই রক্ষা পাওয়া সম্ভব যখন মানুষ অনবরত ইস্তেগফার করতে থাকবে এবং অনবরত খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট থাকবে আর তখনই এক ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সমর্থনের গণ্ডিভুক্ত থাকতে পারে। অন্যথায় যেমনটি মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেছেন, শয়তান তো মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তের সাথে ধাবমান রয়েছে, যেখানেই দুর্বলতা দেখা দেয় সেখানেই সে আক্রমণ করে।

অতএব এই মাগফিরাত এবং ক্ষমার দিন তখনই আমাদের কাজে আসবে যখন আমরা এ দিনগুলোর কল্যাণরাজিকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানানোর চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষাগণ্ডিতে থাকার লক্ষ্যে নিজেদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রেখে ইস্তেগফারের মাধ্যমে সেগুলোর চিকিৎসা করতে থাকব। অন্যথায় কিছু কিছু রোগ-বালাই যেভাবে চিকিৎসা সত্ত্বেও মানবদেহ থেকে পরিপূর্ণরূপে দূর হয় না বরং সুপ্ত বা ঘুমন্ত অবস্থায় চলে যায়, অর্থাৎ বাহ্যত তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না কিন্তু কোন সময় পুনরায় সক্রিয় হয়ে সেসব রোগ মাথাচাড়া দেয়, যখন অন্য কোন রোগ দেখা দেয় আর দেহ দুর্বল হয় তখন এসব সুপ্ত রোগব্যাধি পুনরায় জেগে ওঠে এবং আক্রমণ করে। মানুষের আত্মিক, আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক রোগবালাইও তদ্রুপ হয়ে থাকে। মানুষ যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পরিপূর্ণরূপে পালনের চেষ্টা না করতে থাকে, তওবা এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে নিজেদের সেসব অবস্থাকে এবং সেসব ব্যাধিকে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের মাধ্যমে চাপা দিয়ে না রাখে, তবে এগুলো নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে মানুষকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

অতএব কেবল পাপ থেকে ক্ষমা লাভই ইস্তেগফারের উদ্দেশ্য নয়, বরং ভবিষ্যৎ পাপ থেকে সুরক্ষা লাভের জন্যও এটি আবশ্যক, যেন মানবীয় দোষত্রুটি দুর্বল হতে থাকে আর মানুষ পূর্ণরূপে ঐশী সন্তুষ্টির পথে পদচারণা করে। এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার এক বিশেষ অনুগ্রহ যে, একে তো আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে লাগাতার ও স্থায়ী ইস্তেগফারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন আর সেই সাথে বছরে একবার আমাদেরকে একটি ইনটেন্সিভ তথা নিবিড় ও সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত করেন যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার অধিক নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হই। একবার সে গণ্ডিতে প্রবেশ ঘটলে সেই গণ্ডির ভেতর আরো যেসব উচ্চ মর্যাদা রয়েছে সেগুলো অর্জনের চেষ্টা করুন। অতএব, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমা যাচনা করি তবেই এ দশক, যা পার হচ্ছে, আমাদের পাপ ও ভুলত্রুটিসমূহ ঢেকে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য দানকারী হবে। যদি কেবল এই অর্থ নেয়া হয় যে, এ দশকে রোযা রেখে, নামায পড়ে বা কিছু নফল আদায় করে এরপর সারা বছর ভুলে যাব যে, রমজানে কি করেছিলাম, তাহলে এটি ক্ষমার দশক হতে পারে না। অতএব, এ মাস এবং এ দশক থেকে আমরা তখনই লাভবান হতে পারব, তখনই সফলভাবে অতিক্রম করতে পারব যখন আমরা এ অঙ্গীকার করব এবং চেষ্টা করব যে, পূর্বে যেসব পাপ ও ভুলত্রুটি হয়েছে আমরা সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করব না। এটিই প্রকৃত ইস্তেগফার ও সেই তওবা যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান।

সাধারণত 'ইস্তেগফার' ও 'তওবা'– এ দুটি শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?– এই বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট করছি। যেভাবে আমাদের যারা পবিত্র কুরআন পাঠ করে, তারা জানে যে, আল্লাহ্ তা'লা এ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন, **وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ** (সূরা হুদ:৪) অর্থাৎ আর তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এরপর তওবারত অবস্থায় তাঁর প্রতি বিনত হও।

এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখ! এ উম্মতকে দু'টি জিনিস দান করা হয়েছে। একটি শক্তি অর্জনের জন্য, দ্বিতীয়টি অর্জিত শক্তিকে কর্মের আদলে প্রকাশ করার জন্য।" **(মলফুযাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৭)** অর্থাৎ ইস্তেগফার সেই অস্ত্র যার মাধ্যমে শয়তানের বিরুদ্ধে

লড়াই করা যায় এবং তওবা হচ্ছে সেই অস্ত্র ব্যবহার করা, অর্থাৎ সেসব কর্মশক্তির প্রকাশ, যার মাধ্যমে শয়তান দূরে থাকবে। আমাদের প্রবৃত্তি যেন কখনো পরাভূত না হয়– এর জন্য সেসব পুণ্য ও আমল করার অনবরত চেষ্টা আবশ্যক, যা করার নির্দেশ খোদা তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন, নয়তো ইস্তেগফার ফলপ্রসূ হতে পারে না, আর ক্ষমা লাভ করা সম্ভব নয়। এক রোযাদার ব্যক্তি নামাযও পড়ছে, নফলসমূহও আদায় করছে, পবিত্র কুরআনও পাঠ করছে, সম্ভব হলে এবং সময় থাকলে দরসও শুনে, কিন্তু যদি সেসব নির্দেশ পালন না করে যা আল্লাহ্ তা'লা নিজ ভ্রাতাদের অধিকারের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, তাহলে এটি সত্যিকার তওবা ও ইস্তেগফার নয়। রোযা থেকে সত্যিকার কল্যাণ লাভের চেষ্টা নয়। সত্যিকার উপকার তখনই হবে যখন ইস্তেগফারের মাধ্যমে যে শক্তি অর্জনের চেষ্টা করা হয় সেটিকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য খাঁটিভাবে ব্যবহার করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা পাপসমূহ ঢেকে রাখার যে শক্তি দান করেছেন, যেসব পাপ দূর করার সামর্থ্য দান করেছেন, ইস্তেগফারের মাধ্যমে পাপমুক্ত হৃদয়কে তাৎক্ষণিকভাবে পুণ্যের মাধ্যমে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে হবে। নিজের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করতে হবে। নতুবা হৃদয়পেয়ালা যদি পুণ্যশূন্য থাকে তাহলে শয়তান সেটিকে পুনরায় সেসব নোংরামিতে ভরে দিবে। এজন্যই খোদা তা'লা বলেছেন, يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا (সূরা তাহরীম-০৯) অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ্ তা'লার প্রতি খাঁটি তওবা করে বিনত হও। সুতরাং সেই ইস্তেগফারই স্থায়ী ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করে যার সাথে একনিষ্ঠ তওবা থাকে, যাকে মানুষ এরপর পুণ্য দ্বারা পূর্ণ করতে থাকে। সর্বদা হুকুকুল্লাহ (আল্লাহ্‌র অধিকার) এবং হুকুকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) প্রদানের প্রতি দৃষ্টি রাখে, অনবরত চেষ্টা করে।

একনিষ্ঠ তওবার জন্য কী করা প্রয়োজন? এর জন্য তিনটি বিষয়ের দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

প্রথম বিষয় হলো, প্রত্যেক পাপের ধারণা এবং এর বাসনা সর্বপ্রথম মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়। সুতরাং যতক্ষণ নিজের মস্তিষ্ককে পবিত্র রাখার চেষ্টা না করা হবে, ততক্ষণ একনিষ্ঠ তওবা হতে পারে না। মুখে اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ বলায় কোন লাভ হয় না; যতক্ষণ মস্তিষ্কও এর সাথে না থাকে।

এরপর দ্বিতীয় বিষয় হলো, যদি কোন পাপ হয়ে গিয়ে থাকে অথবা মাথা থেকে সেই পাপের ধারণা বের না হয় বা দূর না হয় তাহলে সেটিকে দূর করার চেষ্টার সাথে এর জন্য মানুষের অনুশোচনা এবং অনুতাপ করা উচিত। পাপের মাঝে শুধু বড় পাপই নয় বরং সর্বপ্রকার পাপ, অন্যের অধিকার হরণ, কাউকে খারাপ কথা বলা– এগুলো সবই পাপ এবং তওবা কবুল হওয়ার পথে বাধ সাধে।

বহু লোক মামলা-মোকদ্দমায় অন্যদের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করে, এমনকি আপন ভাইরা একে অপরের অধিকার হরণ করার চেষ্টায় রত থাকে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে প্রতারণা করতে থাকে, সুতরাং এ ধরনের কর্মকাণ্ড করে এরপর আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমার আশা করা এবং মনে করা যে, আমরা তওবা করছি– এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা, মানুষের খামখেয়ালী বা

ভুল ধারণা। তওবা তখন প্রকৃত এবং খাঁটি গণ্য হবে যখন কোন ছোট ভুল হয়ে গেলেও এর জন্য চরম অনুশোচনা এবং দুশ্চিন্তা থাকবে।

অতঃপর তৃতীয় বিষয় হলো, তওবাকারীর সংকল্প দৃঢ় এবং অটল হতে হবে যে, আমি ইস্তেগফার করে সর্বপ্রকার পাপ পরিহার করবো। যদি শুধু এই চিন্তা থাকে যে, এই রমজান ক্ষমা লাভের মাস। এতে কিছু সময়ের জন্য পাপ এড়িয়ে চল, অন্যদের অধিকার হরণ করা হতে বিরত থাক, বাকি পরে দেখা যাবে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা, যিনি মনের অবস্থা জানেন, এমন লোকদের ক্ষমার বিষয়টি বিবেচনা করেন না। আল্লাহ্ তা'লা তো স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, **توبة النصوح** কর; অর্থাৎ একনিষ্ঠ তওবা কর। কোন ধোঁকার সংমিশ্রণ যেন না থাকে। খোদা তা'লাকে ধোঁকা দেয়া যায় না।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তওবাকারী ব্যক্তি যদি নিজের মাঝে এই তিনটি বিষয় সৃষ্টি করে তাহলে খোদা তা'লা তাকে খাঁটি তওবা করার তৌফিক দান করবেন। এমনকি তার মাঝে বিদ্যমান যাবতীয় মন্দ বিষয়াদি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অনুপম চারিত্রিক গুণাবলী তার স্থান দখল করবে; আর এটি হলো চরিত্রকে জয় করা। এরপর শক্তি ও দৃঢ়তা প্রদান একান্তই আল্লাহ্ তা'লার কাজ, কেননা তিনিই যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতার আধার। এই সত্যিকার তওবা, যা মন্দকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেয়– এর উল্লেখ আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও করেছেন। তিনি বলেন, **مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا** (সূরা ফুরক্বান: ৭১)। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তওবা করে ও ঈমান আনয়ন করে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে; এরাই সেসব লোক যাদের মন্দকর্মগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যকর্মে পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।

অতএব এই বিপ্লব আনয়নের প্রয়োজন যে, প্রথমত মনমস্তিষ্ককে পবিত্র রাখার জন্য ইস্তেগফারের মাধ্যমে জিহাদ বা সংগ্রাম করা। এরপর তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর মন্দকর্মের জন্যও যেন অনুশোচনা ও লজ্জা হয়। অতঃপর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন, অর্থাৎ অবস্থা যা-ই হোক না কেন, যে প্রলোভনই দেখানো হোক না কেন পাপের ধারে কাছেও যাব না। সেইসাথে নিজের প্রতিটি কাজ ও কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছাধীন করার চেষ্টা করতে হবে। আর রোযার যে দিনগুলো লাভ হয়েছে, তাতে যেন মানুষ ধৈর্য ও ত্যাগ-স্বীকারের প্রশিক্ষণ লাভের চেষ্টা করে। রোযার কল্যাণরাজি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য এই চেষ্টাই কাজে আসবে; আর এই চেষ্টাই করা উচিত, তবেই ক্ষমার দশক ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করবে। শুধু মধ্যবর্তী দশকই নয় বরং পরবর্তী দশকও ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করবে। আর শুধুমাত্র রমজান মাসই নয়, বরং এরপর আসন্ন প্রতিটি মাস এবং প্রতিটি বছর, বরং প্রতিটি বছরের প্রতিটি দিন ক্ষমার উপকরণ নিয়ে আসবে। অতএব সেই চেতনাকে বৃদ্ধি করা এবং এর ওপর আমল করার চেষ্টা আমাদের করা উচিত যা মহানবী (সা.)-এর সেই উক্তির পেছনে রয়েছে যে, মধ্যবর্তী দশক ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "বিবেক এ কথা কীভাবে মেনে নিতে পারে যে, বান্দা খাঁটি অন্তঃকরণে খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে অথচ খোদা তা'লা তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না, বরং খোদা, যার সত্তা অত্যন্ত দয়ালু ও কৃপালু হিসেবে প্রমাণিত, তিনি বান্দার চেয়ে অনেক বেশি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেন। এজন্যই পবিত্র কুরআনে খোদা তা'লার একটি নাম 'তাওওয়াব' বলা হয়েছে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তনকারী বা অনেক বেশি কৃপাদৃষ্টি দানকারী।

অতএব বান্দার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা অনুতাপ, অনুশোচনা, নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ও বিনয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে আর খোদা তা'লার ক্ষেত্রে তা হয় দয়া এবং ক্ষমার মাধ্যমে।"
(চশমায়ে মা'রেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব আমাদের মধ্য থেকে তারা সৌভাগ্যবান যারা প্রকৃত ইস্তেগফারকারী ও একনিষ্ঠ তওবাকারী এবং রমজানের বরকতময় মাসে এর প্রভাবকে নিজেদের মাঝে অভিজ্ঞতা করে খোদা তা'লার ক্ষমা ও অনুগ্রহের দৃশ্য অবলোকনকারী। যদি অলসতা প্রদর্শিত হয় তবে তা বান্দার পক্ষ থেকে, যদি দুর্বলতা প্রদর্শিত হয় তবে তা বান্দার পক্ষ থেকে হয়; নতুবা যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বান্দার তুলনায় অনেক বেশি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করেন। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তিনি চান যেন বান্দা তাঁর কাছে আসে আর তিনি তার তওবা গ্রহণে প্রস্তুত। যেমনটি তিনি বলেছেন, وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ (সূরা নিসা : ২৮)। অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন ও তওবা গ্রহণ করে সদয় দৃষ্টিপাত করতে চান। অতএব এটি কীভাবে সম্ভব যে, যে কাজকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা (এমনটি) চান; তা আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ করবেন না! অতএব বান্দার কাজ হলো সে যেন ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়, এরপর সে প্রত্যক্ষ করবে যে, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তার প্রতি অগ্রসর হন।

অতএব এই মাসে যখন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও ক্ষমা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি তাঁর বান্দাদের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে, তখন আমাদের উচিত এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা এবং সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশকে দৃষ্টিপটে রাখা যে, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (সূরা ফুরকান: ৭২)। অর্থাৎ, আর যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে বস্তুত সে-ই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি প্রকৃত তওবা সহকারে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব প্রকৃত তওবার পাশাপাশি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করাও আবশ্যক যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যেখানে বলছেন যে, মধ্যবর্তী দশককে আমি ক্ষমার দশক বানিয়েছি– এটি তখনই কার্যকর হবে যখন আমরা আমাদের সকল কর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অধীন করার চেষ্টা করব।

অতএব ইস্তেগফার ও সৎকর্ম যখন আমাদেরকে রমজানের শেষ দশকে প্রবিষ্ট করবে তখন এটি আল্লাহ্‌র রসূলের (সা.) ভাষ্য অনুযায়ী আগুন হতে মুক্তিদানকারী দশক হবে। আল্লাহ্ তা'লা এক স্থানে বলেছেন, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (সূরা আনফাল: ৩৪)। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা এমন নন যে, ক্ষমা প্রার্থনারত অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

আল্লাহ্ তা'লা তো বিভিন্নভাবে আমাদেরকে বুঝাতে থাকেন। পূর্ববর্তীদের ঘটনা বর্ণনা করে, নবীদের ঘটনা বর্ণনা করে, নবীদের মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করে যে, কী কী উপায়ে তোমরা আমার নিকট ক্ষমা যাচনা করতে পারো এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলোর সাথে আমি কীরূপ আচরণ করে এসেছি এবং এখনও করবো। জানা কথা যে, মানুষ যখন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে 'হুকুকুল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র অধিকার ও 'হুকুকুল ইবাদ' বা বান্দার অধিকার প্রদানের চেষ্টা করে, নিজের নামাযেরও সুরক্ষা করে, নফল ইত্যাদির মাধ্যমে সেগুলোকে সজ্জিত করে, ইস্তেগফারও করে আর অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদনেরও চেষ্টা করে, এমনকি যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যদি তার সাথে ঝগড়া করে, তাকে গালমন্দ করে তাহলে সে যেন এর কোন উত্তর না দেয় বরং এটি বলে যেন

নিশ্চুপ হয়ে যায় যে, আমি রোযাদার। আমি তো সেই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আর আমার চেষ্টা হলো, খোদা তা'লার নির্দেশাবলীকে নিজ জীবনের অংশ বানিয়ে নেয়া, তাহলে অবশ্যই এরূপ ব্যক্তি এরপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করে সে আগুনের আযাব থেকে অবশ্যই মুক্তি লাভ করে এবং তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করে। শুরুতে আমি যে হাদীস উদ্বৃত করেছিলাম, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এটিও লিখা রয়েছে যে, যে বক্তি এ মাসে কোন ভালো গুণ অবলম্বন করে, অর্থাৎ যে কোন ভালো কাজ বা কর্ম করে, পুণ্য অবলম্বন করে, সে সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যায় যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি আবশ্যিক দায়িত্ব পালন করেছে সে সেই ব্যক্তির ন্যায় হবে যে রমজানের বাইরে সত্তরটি ফরয কাজ করেছে। আর রমজান মাস ধৈর্য ধারণ করার মাস, আর ধৈর্যের ফল হচ্ছে জান্নাত। এটি সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের মাস, অর্থাৎ অন্যের দুঃখ-কষ্টে অংশীদার হওয়া, অন্যের সাথে নম্র ব্যবহার করা, অন্যদের ক্ষমা করা, পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করা, আর এই সমস্ত বিষয় মানুষের প্রাপ্য প্রদান ও সৎকর্ম করার শক্তি জুগিয়ে থাকে। বরং এগুলো হচ্ছে সেটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

আর এই সমস্ত বিষয় যখন একত্রিত হয়ে যায় তখন এমন লোকদেরকে মহানবী (সা.) আগুনের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার সু-সংবাদ দিয়েছেন। লাগাতার পুণ্যকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালন করা আর নিজেদের বিরুদ্ধে হওয়া অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করার কারণে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) তাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন।

সাধারণত রমজান মাসে পাকিস্তানেও এবং কতিপয় অন্য দেশেও, যেখানেই এসব তথাকথিত আলেমরা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের বিপথে পরিচালিত করে রেখেছে, সেখানে আহমদীদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যা আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমনটি আমি গত খুতবাতেও বলেছিলাম যে, আহমদীদের আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত করা, আর তাদের আধ্যাত্মিক এবং ধন ও জনসম্পদের ক্ষতি করার অপচেষ্টা করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, ধৈর্যের আঁচল কখনো হাতছাড়া করো না। আর রমজান মাসে তো বিশেষভাবে সেই মু'মিনকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) জান্নাতের সু-সংবাদ প্রদান করছেন যে পুণ্য কাজ সম্পাদন করছে এবং ধৈর্য প্রদর্শন করছে। এ কারণে এই তরবিয়তী মাসে প্রত্যেক আহমদীর বিশেষভাবে দোয়া, ইস্তেগফার, নফল ইবাদত এবং ধৈর্য প্রদর্শন করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতকে নিজেদের নিকটতর করার প্রচেষ্টা করা উচিত। আর এরূপ কর্ম সম্পাদনকারী, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا (সূরা দাহর: ১৩)। অর্থাৎ, আর তাদের পুণ্য কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও ধৈর্য ধারণ করার কারণে তাদেরকে জান্নাত ও রেশম দেয়া হবে। অতএব আজ যদি আহমদীদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন হয়ে থাকে, তবে আমাদের মাঝে প্রত্যেক ব্যক্তি এ কথা জানে যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী আগত ইমামকে মান্য করার কারণে এই অত্যাচার আমাদের ওপর করা হচ্ছে। তাই শত্রুদেরকে তাদের অত্যাচার করতে দিন এবং ধৈর্য ধারণ করুন, এতেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হব। অত্যাচারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তার উদাহরণ পবিত্র কুরআনে অসংখ্য রয়েছে। এটি আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন যে, এই অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারীদের সাথে তিনি

কী আচরণ করবেন। কিন্তু এই দিনগুলোতে আমাদের উচিত হলো মানবজাতির জন্য সাধারণভাবে ও মুসলিম উম্মতের জন্য বিশেষভাবে আশিস লাভের দোয়া করা। কতক আহমদী মনে করেন এরূপ অত্যাচারের পর দোয়া করা যায় না। কিন্তু আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলমানদের অধিকাংশ যদিও ধর্মের বিষয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে তারা সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত, অথবা স্বল্প জ্ঞান রাখে, অথবা আলেমদের ভয়ে ভীত থাকে। তথাকথিত আলেমরা তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করছে।

অতএব রমজান মাসের এই শেষ দশকে ধৈর্যের পরম বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে, দোয়া ও নফল ইত্যাদির ওপর জোর দিয়ে, ইস্তেগফার ও তওবা করে, পুণ্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে, সর্বদা তাকওয়ার পথে চলার অঙ্গীকার করে আগুন থেকে দূরে থাকার ও জান্নাত লাভকারী হওয়ার চেষ্টা করুন।

এই রমজানে কল্যাণ লাভের মাধ্যমে আমাদের সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (সূরা শুআরা: ৯১)। অর্থাৎ, আর জান্নাত মুত্তাকীগনের নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। তা দূরে থাকবে না। هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ (সূরা ক্বাফ: ৩৩)। অর্থাৎ, এ হলো তা, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য যে খোদা তা'লার সামনে বিনত হয়। যে নিজ কর্মের সুরক্ষাকারী– তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শরীয়তের যেসব নির্দেশাবলী প্রদান করেছেন– তার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জন্য এই প্রতিশ্রুতি। কাজেই আমাদের প্রত্যেকের রমজান মাস সেভাবে কাটানোর চেষ্টা করা উচিত যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূল (সা.) তা কাটানোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে শেষ দশকেও এই আশিসরাজি সমবেত করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী এবং তাঁর জান্নাতে প্রবেশকারী হওয়ার মর্যাদা দিন আর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করার সামর্থ্য দান করুন।

আজ পুনরায় জুমুআর পর আমি গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি দুঃজনক সংবাদ হলো, যেমনটি আমি গত জুমুআয় দোয়ার অনুরোধ করেছিলামা যে, আমাদের এক ভাই শেখ সাঈদ আহমদ সাহেব, যাকে তার দোকানে বসে থাকা অবস্থায় আহমদীয়াতের বিরোধিতার কারণে গুলি করা হয়েছিল। তিনি হাসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় ছিলেন। বারো দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকেও তিনি আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনিও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। এই শহীদও যৌবনেই নিজের রক্ত দিয়েছেন। তার বয়স ছিল ৪২ বছর। গত বছরই তার বিয়ে হয়েছিল। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় তার ঘরে প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। অল্প সময়ের জন্য তার জ্ঞান ফিরলে তাকে বলা হয় যে, আপনার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে, তিনি কিছু বলতে পারেন নি, কিন্তু তার চোখ সামান্য সিক্ত হয়ে উঠে।

এই যুবক শেখ সাঈদ সাহেব যে বংশের, তাতে পূর্বেও আরো তিনজন শাহাদাত বরণ করেছে। তার পিতা শেখ বশীর সাহেবকে আহমদীয়াতের কারণে বিষ মিশিয়ে শহীদ করা হয়। অতঃপর এক ভাই শেখ মুহাম্মদ রফিক সাহেব ও তার মামা প্রফেসর ডাক্তার শেখ মুবাশ্বের আহমদ সাহেবকে গুলি করে শহীদ করা হয়েছিল। শেখ মুবাশ্বের আহমদ সাহেবকে তো এ বছরেরই প্রারম্ভে শহীদ করা হয়।

শেখ সাঈদ সাহেবও খুবই নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার মুখে সর্বদা হাসি লেগে থাকত। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ধর্মের সেবক ও দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র বিষয়ে গভীর আগ্রহ রাখতেন। ১৯৯০ সালে মৌলভীরা তার বিরদ্ধে সেনাবাহিনীতে অভিযোগ করে, যার ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর জামিনে মুক্তি লাভ করেন। যেমনটি আমি বলেছি, মরহুম স্ত্রী, এক পুত্র এবং মা-কে রেখে গেছেন যার বয়স ৭২ বছর। তার জন্যও বৃদ্ধ বয়সে এই আঘাত অত্যন্ত কঠিন। তাদের সবাইকে দোয়ায় স্মরণ রাখুন।

গত জুমুআয় যখন আমি দুইজন শহীদের কথা উল্লেখ করেছিলাম তখন ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের উল্লেখ এলাকায় তার সুপরিচিতি এবং কতিপয় কাজের জন্য ছিল। এছাড়া মিরপুর খাস জেলাটিও অনেক বড় জেলা, সেখানে আমাদের জামা'তও অনেক বড়। তার তুলনায় নওয়াব শাহ ছোট্ট একটি জেলা। এটি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন যে, কার সাথে কী ব্যবহার করবেন। শাহাদাতের মর্যাদা উভয়েই লাভ করেছেন। কয়েক দিন পূর্বে আমার কাছে কিছু সমবেদনাসূচক পত্র আসে। সেগুলোর মধ্য থেকে একজন ভালো শিক্ষিত ব্যক্তি কেবল ডাক্তার সাহেবের জন্য সমবেদনা জানান। অথচ যদি আমার কাছে সমবেদনা জানাতেই হয় তাহলে দুইজন শহীদের জন্যই সমবেদনা জানানো উচিত ছিল। শেঠ সাহেবের সাথেও আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, অত্যন্ত নীরব কর্মী ছিলেন। ধর্মের জন্য গভীর আন্তরিকতা ও আগ্রহ পোষণকারী কর্মী ছিলেন। আমি অনেক বার নওয়াব শাহ গিয়েছি, আর যখনই গিয়েছি, তিনি বিশেষভাবে সাক্ষাতের জন্য আসতেন, মিটিং করতেন, জামা'তী কাজে পরামর্শ নিতেন আর এরপর তার ওপর আমল করার চেষ্টা করতেন। যাহোক আমি এই বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট করতে চেয়েছিলাম।

আজ দ্বিতীয় গায়েবানা জানাযা যার এখন পড়া হবে তিনি হলেন আমাদের এক সিরিয়ান বোন মারওয়া আল-গালুল সাহেবা। তিনি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে পিছন থেকে কোন ট্রাক বা গাড়ি ধাক্কা দেয়। এতে তিনি কিছুদিন হাসপাতালে ছিলেন। এরপর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তার বয়স ছিল ২৪ বছর, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি আমাদের আরবী ওয়েবসাইট 'আজওয়েবাহ আনিল ঈমান'-এ খুবই পরিশ্রমের সাথে কাজ করছিলেন আর এর জন্য সকল কঠিন কাজ তিনি করেছেন। অনুরূপভাবে 'আল-ইসলাম' ওয়েবসাইটে যাকাত বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় লিখিত একটি বইয়ের তিনি আরবী ভাষায় অনুবাদও করেছেন। এই অনুবাদ শেষ হওয়ার পর তিনি আসলে সেটিকে পুস্তকাকারে ছাপানোর জন্য ছাপাখানা বা কোন স্থানে যাচ্ছিলেন, তখনই দুর্ঘটনার শিকার হন। খুবই পুণ্যবতী মহিলা, তাকওয়াশীলা ও ধর্মসেবার চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অধিকাংশ সময় বলতেন, আমি যেন ধর্মের কাজ করার সুযোগ পেতে থাকি। এখানে তার বাগ্‌দত্ত মুহাম্মদ মালাস সাহেব রয়েছেন যিনি এম.টি.এ. আল-আরাবিয়া'য় কাজ করেন। শীঘ্রই তাদের বিয়ে হওয়ার ছিল। যাহোক আল্লাহ্‌র তক্বদীর সর্বাগ্রে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর রেখে যাওয়া পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দিন।

তৃতীয় আরেকজনের গায়েবানা জানাযা হবে। তিনিও সিরিয়ান, সামী কাযাক সাহেব। কয়েক দিন পূর্বে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ফিলিস্তিনের একজন নিষ্ঠাবান আহমদী খিযার কাযাক সাহেবের পুত্র ছিলেন আর যুবক বয়সেই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। ১৯৯৬ সনে যুক্তরাজ্যে জলসায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র সাথে সাক্ষাৎ হলে হুযূরের স্নেহপূর্ণ আচরণ প্রত্যক্ষ করার পর ঈমানের ক্ষেত্রে তিনি আরো অগ্রসর হন

এবং ফিরে গিয়ে নিজের একটি বাড়ি জামা'তী প্রয়োজনে বিনা ভাড়ায় জামা'তকে দান করেন এবং বলেন, আমি জামা'তের জন্য দান করছি তাই কোন অর্থ নিব না। তিনি যখন জলসায় এসেছিলেন তখন বলেন, জলসায় এসে আমি জানতে পেরেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত কী জিনিস। খুবই পুণ্যবান প্রকৃতির ও মিশুক মানুষ ছিলেন। দরিদ্রদের সাহায্য করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরও আহমদীয়াতের অলঙ্কারে শোভামণ্ডিত করুন অর্থাৎ তাদেরকে জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুন।